গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান সম্পর্কে ইসলাম কি বলে?

মূল: আবু উসামা
সম্পাদনা: ইসলামবেইস পাবলিকেশন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সূনান আদ দারিমিতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,

> "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন..." [সূরা নাসরঃ ১- ২]

যখন এই আয়াতগুলো নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তারা (মুসলিমরা) দলে দলে ইসলাম পরিত্যাগ করবে যেমনিভাবে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।"

গণতান্ত্রিক শাসনের অধীনে বসবাসরত মুসলিমদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে একটি বিষয়কে ঘিরে বিতর্ক চলছে, তা হল তারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা? এই বিতর্কের জবাবে 'ভোট হল সবচেয়ে বড় জিহাদ' এই ধরণের মত যেমন অনেকে পোষণ করে, তেমনি এর বিপরীতে এমন মতও অনেকে ধারণ করে যে, যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে ভোট দিল যে তাদের উপর কুফরী আইন বাস্তবায়ন করবে, তাহলে ভোট দেওয়ার সাথে সাথে ভোটদানকারী মুরতাদ হয়ে যাবে, নির্বাচিত ব্যাক্তি ক্ষমতালাভ করুক বা না করুক।

১৪০০ বছর পূর্বে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ইসলামী শরীয়াহই মুসলিমদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মাত্র ৯০ বছর হল খিলাফাহ ধ্বংস হয়েছে; খিলাফাহ ধ্বংসের পর থেকে আমরা তা হারিয়েছি। আমরা যদি নিকট ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাবো কুফফাররাই বিভিন্ন সময়ে রাজতন্ত্র, সাম্যবাদ কিংবা সমাজতন্ত্র সহ ইত্যাদি দ্বারা শাসিত হয়েছে। এবং সময়ের আবর্তনে প্রতিটি মতবাদই ডিগবাজী খেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং সবশেষে এখন পুঁজিবাদ এসে সেই স্থান দখল করেছে। সেই থেকে পশ্চিমা দেশগুলোতে গণতন্ত্রই আসল রাজনৈতিক ব্যবস্থা, মুসলিম ভূমিগুলোতেও একটা পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রের চর্চা আজ হচ্ছে।

বিশ্বের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের মুখে মুখে আজ 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' কিংবা 'উদারনীতি'র স্লোগান । এই আদর্শগুলো ইনিয়ে- বিনিয়ে এই কথাই বলতে চায়, মানুষ তার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নিজেই আইন কানুন ও বিধিবিধান প্রণয়ন করবে, এবং এতে স্রষ্টার কিছুই বলার থাকবে না। কিন্তু মুসলিম হিসেবে সৃষ্টিকর্তা ও হুকুমদাতা মহান আল্লাহর আইন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়েও চালু থাকা এবং তা মেনে চলার সুবিশাল ঐতিহ্য - ইতিহাস আমাদের রয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন শরীয়াহর বাস্তবায়ন নেই, তখন আমাদের সামনে গণতন্ত্রকে গ্রহন করা, এই ব্যবস্থায় অংশ

নেওয়া ও অনুগামী হওয়া, এর অনুসরণ করা এবং গণতন্ত্রের প্রতি অনুগত হওয়ার মতো বিষয়গুলো যখন চলেই আসে, তখন আমাদের উপর ইসলামের হুকুম কি?

গণতন্ত্র কী?

এই ব্যাপারে কোন বিতর্কের কোন অবকাশ নেই যে, যেসব মুসলিমরা পশ্চিমা দেশে বসবাস করছে সেসব দেশকে ফিক্বহী বা ইসলামী আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দ্বিধায় দারুল কুফর বলা যায়, অর্থাৎ কুফরের ভূমি। কারণ সেসব দেশের আইন কানুনগুলো শরীয়াহ'র উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়নি, বরং কুফফারদের কামনা বাসনা কিংবা খেয়াল- খুশি হল এসব আইনের ভিত্তি, যা পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রণীত হয়। রাজনৈতিক সংজ্ঞানুসারে, যে প্রক্রিয়ায় জনগণ নিজেদের জীবনযাপনের জন্য নিজেদের পছন্দ মতো আইন নির্ধারণ করতে পারে তাই গণতন্ত্র নামে পরিচিত। গণতন্ত্রের মানে হল 'জনগনের শাসন', এটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। এই মতবাদের সবচেয়ে যুতসই অভিব্যাক্তি হল, "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য শাসন, জনগণের শাসন" যা এই মতবাদের প্রস্তাবকদের মুখে শোনা যায়।

নির্বাচন পদ্ধতি

এই শাসন প্রক্রিয়ায়, জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের চোখে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে চার বা পাঁচ বছরের জন্য মনোনীত করে থাকে, এই প্রক্রিয়াটিকে ভোটিং বলে। বিভিন্ন আসনে যারাই ভোটে এগিয়ে থাকবে তারাই সংসদে নিজেদের জন্য আসন পাবেন অর্থাৎ সংসদ সদস্য হিসেবে মনোনীত হবেন। যে দল বেশী সংখ্যক আসনে জয় লাভ করবে তারাই সরকার গঠন করবে। নতুন আইনগুলো সংসদেই উত্থাপিত হয়, সেখানে আলোচনা করা হয় এবং প্রণীত হবে। কোন আইন বাদ দেয়া কিংবা সংশোধনের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ইউরোপীয় ইউনিয়েনে যোগদান সহ ইত্যাদি সিদ্ধান্তগুলো নির্ভর করে এই অধিকাংশ সংসদ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, জনগণ যাদের শুরুতে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করেছে মূলত তারাই এই সিদ্ধান্তগুলোর ব্যাপারে দায়বদ্ধ।

নির্বাচন প্রক্রিয়া

এখন, যদি এই সংসদের অধিকাংশ সংসদ সদস্য মনে করে যে, মদের বৈধতা দেয়া উচিত (যেমনটা কুফফারদের দেশে রয়েছে) তবে এটাই আইন (কানুন) হিসেবে গৃহীত হবে। উপরন্তু, জনগন যদি মনে করে পতিতাবৃত্তি, জুয়া, শিশু যৌনতা (paedophilia), মুসলিম নিধন (যেমনটা আফগানিস্থান, ইরাকসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে যা চলছে),

সমকামীতা, সমলিঙ্গের বিবাহ (homosexuality) ইত্যাদি তাদের জন্য উপকারী এবং হিতকর তবে ভোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এইসব আইনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে; এটাই হল জনগণের দ্বারা জনগণের শাসনের একটি রূপ।

উপরে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যদিও কিছুটা সাদামাটা কায়দায়, সত্যিকার ঈমানদার মুসলিমদের মনে এ প্রশ্নই মাথাচাড়া দেবে যে, এই বিষয়ে ইসলাম কী বলে। এ কথা বলার কারণ হল, দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এমন একটা সময়ে বসবাস করছি যেখানে লোকজন নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয় ঠিকই কিন্তু কোনো বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এবং তাঁর রাসূল (সা) এর বক্তব্য কী, সে বিষয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই; বরং পার্থিব জীবনে কিভাবে যত বেশী 'লাভবান' হওয়া যায় সে চিন্তায় সে মগ্ন।

মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য

মুসলিম শব্দটির উৎপত্তি আরবী একটি শব্দ থেকে যার অর্থ 'আত্মসমর্পণ'। অর্থাৎ একজন মুসলিম হলেন তিনি, যিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সত্যিকারের রব মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার নিকট সমর্পণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

> আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সূরা যারিয়াত ৫১: ৫৬]

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার সৃষ্টিকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামকে মেনে চলার জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) শেষ ঐশী বাণী নিয়ে এসেছেন। পুরো মানব জাতির জন্যেই এই শাশ্বত জীবন বিধানটি নাযিল হয়েছে। কেউ যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করে তবে সে অবশ্যই এই শাশ্বত বিধানের সাথে তুলনীয় কোন বিধানই খুঁজে পাবেনা। মূলত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর বিধানে কোন ফাকফোঁকর কিংবা খুত রাখেননি যে যার জন্য মানুষ অন্য কোন বিধান তালাশ করবে।

বস্তুত, যে মানুষ আল্লাহর আইন ছেড়ে দিয়ে অন্যকিছু তালাশ করছে, সে ক্ষতিতে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ তাঁর বিধানে কঠোর, তাই আইন প্রণয়নে আল্লাহ তাঁর সাথে কোনকিছুকে শরীক করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

> নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা তাওবা ৯: ৭২]

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আরো বলেন,

> শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। [সূরা আ'রাফ ৭: ৫৪]

একজন মুসলিমের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সাথে সকল প্রকার শরীক করা (শিরক) থেকে মুক্ত থাকা এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করা। সেক্যুলার অর্থাৎ ধর্মনিরেপক্ষতাবাদীরা যারা ইসলাম থেকে রাজনীতি এবং আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোকে আলাদা করে তারা এই তর্ক জুড়ে দেয় যে, আল্লাহ্ মুসলিমদের সৃষ্টি করেছেন, তো তারা নামায, যাকাত, হাজ্জ ও ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করবে, মসজিদের বাইরে তো আর কিছু নেই। মূলত এই ধরণের মন্তব্য তারাই করতে পারে যারা ইসলাম কিংবা আরবী ভাষা সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ কিংবা ইসলামের উপর তাদের আদৌ কোন বিশ্বাস নেই। যদি শেষেরটাই হয় তবে তাদের মুনাফেক্বী প্রমাণের জন্য এটাই যথেষ্ট; যদিও তারা মসজিদ ভিত্তিক রাজনীতি অস্বীকার করে তথাপি তাদের কুফর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মসজিদেরই মিম্বর ব্যবহার করে। তারা ইসলামকে শান্তির ধর্ম বলে দাবী করে তথাপি ইসলামিস্টদের উপর চড়াও হয় কেননা তারা ইসলামী রাজনীতির সত্যকে তুলে ধরে।

তারা দাবী করে মসজিদের বাইরে অর্থাৎ দেশ পরিচালনার বিষয়ে ইসলামের কোন দিকনির্দেশনা নেই তথাপি তারাই আল্লাহর হালালকৃত বিধানকে হারাম এবং হারামকৃত বিধানকে হালাল প্রমাণের জন্য কুরআন এবং সুন্নাহকে ভুলভাবে ব্যখ্যা করে। ইবাদাহ' শব্দের অনুবাদ করা হয় নিছক উপাসনা করা কিংবা ইবাদত করা, কিন্তু এটার অর্থ শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নই, বরং অনুসরণ করা, মান্য করা, সমর্পণ করা এসব অর্থও ইবাদাহ এর অন্তর্ভুক্ত।

তাই সত্যিকারের মুসলিম হল তারা, যারা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকেই অনুসরণ করে হোক সেটা মসজিদের বাইরে কিংবা ভেতরে; অন্যথা আল্লাহর সাথে শিরক করা হবে। শিরক হল আল্লাহর নামের সাথে, তাঁর গুণাবলীর সাথে কিংবা তাঁর রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্ব) কিংবা উলুহিয়্যার (ইবাদাত) সাথে অংশীদারত্ব স্থাপন করা। এই মিথ্যা শরীকের চরিত্রে অবতীর্ণ হতে পারে কোন দেবতা, কোন বস্তু, কোন মানুষ, জনগণ বা (মানবরচিত) আইন। আল্লাহর কাছে শিরক হল সবচেয়ে বড় গুনাহ, এবং যেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন,

> নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। [সূরা নিসা ৪: ৪৮]

আল্লাহর সাথে শিরক করা মানেই প্রতিমা কিংবা মূর্তিকে পূজা করা নয়, বরং এটা যে কেউ কিংবা যে কোন কিছু হতে পারে যাকে। যাকে আল্লাহর পরিবর্তে আনুগত্য করা হয়, অনুসরণ করা হয়, মান্য করা হয় কিংবা যার কাছে নিজেকে সমর্পন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষঃ এমপি, পপ স্টার, সেলেব্রেটি, এথল্যাট ইত্যাদি। আইনপ্রণয়নঃ মানব রচিত আইন, মানব রচিত বিচার ব্যবস্থা। তত্ত্বঃ ডারউইনবাদ, বিবর্তন, বিগ ব্যাং ইত্যাদি, মানব রচিত মতবাদঃ পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি।

ভোটিং প্রক্রিয়া

ভোটিং হল সেই পদ্ধতি যার মধ্য দিয়ে একদল মানুষ অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত থেকে একটা বেছে নেয়। এখানে যে ভোটিং সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে সেটা হল ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে দেশ শাসনের জন্যে কোন রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় বসানোর প্রক্রিয়া। একবার নির্বাচিত হবার পর তারা আইন এবং সংবিধানের উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের মতো অর্থাৎ মানুষ- কর্তৃক- রচিত আইন দ্বারা দেশ শাসন করবে, এই পদ্ধতিটিই গণতন্ত্র নামে পরিচিত। অপরদিকে আমরা বলেছি ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা, অর্থাৎ শাসন ও আইন বিষয়ে তাঁর বিধানই সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত। ইসলামের ইতিহাস জুড়ে আমরা দেখি শুধুমাত্র শরীয়াহ আইন দিয়েই ইসলামী খিলাফত তার জনগণকে শাসন করত এবং যারা এর বিরোধিতা করছে কিংবা বিদ্রোহ করেছে তাদেরকে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।

কিভাবে এই ভোটিং প্রক্রিয়াই কাউকে নির্বাচন করা শিরক?

এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া আগে শিরকের ব্যাপারে আলোচনা করে বলেছি, আল্লাহর নাম, গুণাবলী কিংবা তাঁর কার্যাবলির যেকোন কিছুর সাথে কাউকে শরীক করাই হল শিরক। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে যেসব বিষয়ে হুকুম করেছেন সেসব বিষয়ে তিনি হক্বদার এবং একমাত্র তিনিই হক্বদার। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ বলেছেন তিনি এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এখন কেউ যদি দাবী করে যে এই সৃষ্টিতে তাঁকে অন্য কেউ সাহায্য করেছে যেমনটা মরুর আরবরা করেছিল, অথবা যদি একের অধিক উপাস্য দাবী করে যেমনটা মুশরিকরা (পৌত্তলিক) করে থাকে তবে তারা শিরক করল।

শিরকের জন্য ভোট দেয়াও শিরক

আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যাতিরেকে আইন প্রনয়ণের বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। একই সাথে আইন কানুন পাশ করার বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক,

> আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। [সূরা ইউসুফ ১২: ৪০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

> তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। [সূরা কাহাফ ১৮: ২৬]

তিনি অন্য আয়াতে বলেন,

> তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরা শূরা ৪২: ২১]

উপরের আয়াতগুলো খুবই সোজাসাপ্টা এবং স্পষ্টভাবে ঘোষনা দেয় যে বিধান প্রদানের ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার এবং আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে কাউকে শরীক করা আল্লাহ অনুমতি দেননি এবং কেউ করে থাকলে সে হবে মুশরিক।

কুফরের জন্য ভোট প্রদান করাও কুফর

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীতে কুফফারদের বিধান, তাদের পন্থাকে অনুসরণের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন,

> ... এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার- বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। [সূরা তাওবা ৯: ৩০- ৩১]

এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল নিচের প্রেক্ষাপটে -

> যখন আদি ইবনে হাতিম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনলেন, "তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার- বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে" [সূরা তওবা ৯: ৩১]

এরপর, আদী বিন হাতিম (তিনি তখনো মুসলিম হননি) জিজ্ঞেস করলেন: হে নবী(সঃ)! তারা তো পন্ডিত ও দরবেশগণের ইবাদত করে না, তাহলে তাদেরকে কিভাবে রব গ্রহণ করা হলো? মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন: 'তাদের পন্ডিত ও দরবেশগণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম এবং যা হারাম করেছেন তা হালাল করার মাধ্যমে কি আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে না? আদী বিন হতিম উত্তর দিলেন; জি করে। তখন মুহাম্মাদ (সঃ) বললেন; এটাই হলো তাদের ইবাদত করা'। (মুসনাদে আহমাদ,তিরমিযি একে হাসান বলেছেন)।

যদিও আমরা জানি যে ইহুদী এবং খৃস্টানরা তাদের পুরোহিতদের সিজদাহ করেনা কিংবা উপাসনা করেনা; কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিপরীতে তাদের পুরোহিতরা যে বিধান চালু করেছে, অর্থাৎ আল্লাহ যেটিকে হালাল করেছে সেটিকে তারা হারাম করেছে এবং অনুসারীরাও সেটি মেনে নিয়েছে এবং আল্লাহ যেটিকে হারাম করেছেন, তাদের পুরোহিতরা সেটিকে হালাল করেছে এবং তাদের অনুসারীরা তা মেনে নিয়েছে – এটিকেই আল্লাহর রাসূল পুরোহিতদের ইবাদাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আনুগত্য (তা'আহ) হল ইবাদত; এবং এটা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার জন্য নির্দিষ্ট। গণতন্ত্রে আল্লাহর এই গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয় এবং সে স্থলে জনগণের ইচ্ছার আনুগত্য করতে হয়। এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পাশাপাশি জনগণকে রবের আসনে বসানো হয়।

কুফর এবং শিরকের জন্য ভোট প্রদান হল রিদ্দাহ

জেনেশুনে আল্লাহর আইন রেখে মানব রচিত বিধান মেনে চলা হলো রিদ্দাহ (ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন,

> "যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; নিঃসন্দেহে তা গুনাহ। নিশ্চয়ই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচিত করে যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।" [সূরা আন'আম ৬: ১২১]

এই আয়াতের প্রেক্ষাপট জানার জন্য আল-হাকিমে বর্ণিত একটি হাদীস দেখা যাক। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এক দল মুশরিক মুসলিমদের সাথে আইন-প্রণয়ন নিয়ে তর্ক-

বিতর্ক করছিল, সে সময় মুসলিমদের সম্বোধন করে এই আয়াতটি নাযিল হয়। মুশরিকরা বলছিলঃ "যে ভেড়ার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি, তাকে তোমরা বলো 'মৃত', কিন্তু এই মৃত ভেড়ার মৃত্যু ঘটিয়েছে কে?" মুসলিমরা বলল, "আল্লাহ"। তারা প্রতিউত্তরে বলল, "যাকে আল্লাহ তার সোনার ছুরি দিয়ে হত্যা/জবাই করেছেন, তাকে তোমরা হারাম মনে করছ আর তোমরা লোহার ছুরি দিয়ে জবাই করে সেটাকে হালাল মনে করছ??" এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

উপরোক্ত আয়াত ও আয়াত নাযিলের পটভূমি থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, কোন হারাম কাজ করা এবং আল্লাহর আইনের বিপরীতে কুফফাদের প্রণীত আইন অনুসরণ করার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হল 'ইসম' বা গুনাহ করা, যার জন্যে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে। অপরদিকে, আল্লাহ তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে হারাম বলেছেন, সেখানে কেউ যদি আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা না করে সেটাকে হালাল বা অনুমোদিত বলে; তাহলে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়, আর যে এমনটি করে, সে মুশরিক হয়ে যায়।

ব্যর্থ নির্বাচন ব্যবস্থা

মুসলিমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক নির্বাচন করে ক্ষমতায় যেয়ে শরীয়াহ কায়েম করা বহু চেষ্টা চালিয়েছে। এখানে তাদের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাহ অনুসরণে তারা মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

মালয়শিয়াতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইসলামী দল ক্ষমতায় আসার পর, সেই নেতাকে সমকামী ঘোষনা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়, ফলে ক্ষমতা ফিরে যায় সেই সেক্যুলারদের হাতেই। তারা ইসলাম নয়, গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। আলজেরিয়াতেও একবার ইসলামী দল ক্ষমতায় আসে। কিন্তু এরপর সামরিক বাহিনী ক্যু করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়। শরীয়াহর উত্থানকে দমিয়ে তারা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

এ দুটো উদাহরণ থেকেই গণতন্ত্রের হাত ধরে শরীয়াহ কায়েমের অসারতা প্রমাণ হয়, সাম্প্রতিক সময়ের মিশরে ব্রাদারহুড সরকারের উৎখাত আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আজকে অনেক নিষ্ঠাবান মুসলিম যেমন ইসলামী শরীয়াহ কায়েম করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করে চলেছে, কুফফার এবং মুনাফিক্বরাও শরীয়াহর বাস্তবায়ন রুখে দিতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবন থেকে দেখা যায় যে, আল্লাহর রাসূল (সা) দাওয়াহ ছিল এমন অপ্রতিরোধ যে তাঁকে থামাতে কুফফাররা নানা ধরনের কূট কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এমনকি

তারা নবীজিকে দারুন নাদওয়ার (সেসময়ের সংসদ ভবন) নেতৃত্বের প্রস্তাব পর্যন্ত দেয়! তারা এও প্রস্তাব করে যে পালাক্রমে এক বছর তারা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলবে, আর মুসলিমদেরকে পরের এক বছর তাদের মানব রচিত আইনকানুন মেনে জীবনযাপন করতে হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা নিচের সূরাটি নাযিল করলেন,

"বলুন, হে কাফেরকূল, আমি ইবাদত করিনা তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, আমি যার ইবাদত করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা করো। তোমরা ইবাদতকারী নও, আমি যার ইবাদত করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।" [সূরা কাফিরুন]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রস্তাব মেনে না নেওয়ায় মুশরিকরা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। ইসলামের প্রচার প্রসারকে রোধ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল (সা) কে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা) কক্ষনো কুফফারদের খুশী করতে যেয়ে নিজের দ্বীনকে বিসর্জন দেননি, তিনি (সা) তার দাওয়াহর কাজে কোনরূপ সমঝোতা করেন নি। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাওয়াহর ফলস্বরূপ সাহাবাদেরকে কী পরিমাণ অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়েছে, এমনকি কাউকে কাউকে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। তবুও আমরা একটিবার ও শুনিনি যে সাহাবারা (রা) নবীজি (সা) এর কাছে অনুযোগ করছে।

বরঞ্চ তারা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা, লাভ ও দুনিয়াবি স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে তারা অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে গেছেন। এমনকি অনেক দুর্বল মুসলিম আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছে যে তারা সেখানে যেয়ে দ্বীন পালন করতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, আজ যেসব মুসলিম নিজেদেরকে নবীজি (সা) এর সুন্নাহর অনুসারী বলে দাবি করে, তারা এমন একটিও উদাহরণ আনতে পারবে না, যখন নবীজি (সা) বা তাঁর সাহাবা (রা) নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে দ্বীনের বিষয়ে সমঝোতা করেছেন, কিংবা কোন শিরক বা হারামে লিপ্ত হয়েছেন। যারা দ্বীনকে বিকৃত করছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা বলছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট।

এসব পথভ্রষ্টদের খোঁড়া যুক্তি

যদিও এ ব্যাপারে তর্কের কোন অবকাশ নেই যে শরীয়াহ কায়েম করার জন্য দ্বীনের সাথে সমঝতা করা যাবে না, তবুও যারা আল্লাহর রায়ে সন্তুষ্ট নয়, তারা কিছু অন্তঃসারশূন্য কথাবার্তা বলে থাকে। এরা বলে থাকে বাস্তবতার নিরিখে কিছু কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুসলিমরা নির্বাচনে অংশ নিলে কোন সমস্যা নেই। তারা তাদের এই দাবীর পক্ষে ধর্মীয় এবং যৌক্তিত প্রমাণ পেশ করে। নিচে সংক্ষেপে প্রথমে আমরা তাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করবোঃ

প্রথম দাবীঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়ানোর মত ইস্যুগুলোতে সহযোগিতার জন্য আমাদের লোকবল দরকার [বিশেষ করে পশ্চিমা/ইউরোপীয় দেশগুলোতে]

যদিও এ দাবিটি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয় এবং মুসলিমরা প্রায়ই এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, কিন্তু বাস্তবে তা অসঙ্গত। কেউ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব খাটাতে চাইলে, উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তাদের আইন ও প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে ভোট দিতে হলে হাউস অব কমনে মুসলিম ও সমমনাদের পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন; এবং হাউস অব লর্ডসে একটা তারচেয়ে কিছুটা কম হলেও চলে। ইরাক যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যুদ্ধের পক্ষে ভোট পড়েছিল ৩৯৬ টি, যা বিপক্ষের ২১৭ টি ভোটের চেয়ে ১৭৯ টি বেশি। সত্যি বলতে গেলে, ব্রিটেনে মাত্র ১৬ লক্ষ মুসলিম থাকায় এবং কোন পরিষদেই মুসলিমদের পরিষ্কার সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় তারা কখনোই পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব রাখতে পারবে না।

দ্বিতীয় দাবীঃ আমরা ভোট না দিলে বর্ণবাদীরা ক্ষমতা দখল করবে [বিশেষ করে পশ্চিমা/ইউরোপ দেশগুলোতে]

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, MCB, MPAC, YM এবং বিভ্রান্ত ধর্মপ্রচারকেরা এখনো জনগণকে ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবে এ যুক্তিটিকে ব্যবহার করে থাকে। আজ পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক বক্তাই কোন ওয়ার্ড বা পরিষদে বর্ণবাদী BNP (ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির) এর সুদূরপ্রসারী বিজয়ের পক্ষে বলেন নি। যদি তারা ক্ষমতায় এসেও যায়, এর চাইতে বেশি ক্ষতি আর কীই বা করতে পারত? BNP এর সাহায্য ছাড়াই ব্রিটেনে সমকামিতার বৈধতা সর্বজনগৃহীত হয়েছে আর মতপ্রকাশের অধিকারের বয়স ১৮ থেকে নামিয়ে ১৬ করা হয়েছে। জুয়া বৈধতা পেয়েছে, তাদের পররাষ্ট্রনীতির কারণে ইরাক আর আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রাণ হারিয়েছে। শতশত মুসলিমকে কোন অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। যৌনপল্লী আর পতিতালয়গুলো দিনদিন বৈধ বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। স্কুলগুলোতে শেখানো হচ্ছে নাস্তিক্যবাদ, বিবর্তনবাদ আর আন্তধর্ম মতবাদ। ইসলামকে ধর্ম হিসেবে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ফলে মুসলিমরা যেকোনভাবে বৈষম্যের

শিকার হচ্ছেন, যেহেতু তাঁদের ধর্মের কার্যকর স্বীকৃতি আজ অবধি মেলেনি। আর এসবই ঘটেছে কনসারভেটিভ, লিবারেল ডেমোক্র্যাট আর লেবার পার্টির ঐকমত্যের ভিত্তিতেই। তাহলে বলুন, একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম কীভাবে ওই তুচ্ছ যুক্তির প্রেক্ষিতে এ দলগুলোর কোনটিকে সমর্থন জানাতে পারে, তাদের ভোট দিতে পারে?

এসব বাদ দিলেও, ব্রিটিশ ন্যাশনাল পার্টির (BNP) মূলে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠী, অভিবাসনের দরুন যারা তাদের নিজস্ব পরিচয়, সংস্কৃতি ইত্যাদি থেকে দূরে সরে গেছে। এখন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩% মুসলিমরা দৈনন্দিন জীবনে আর মিডিয়ায় যতই তাদের কণ্ঠ জোরালো করবে, ততই ব্রিটেনের আদিবাসীরা নিজেদের ব্রিটিশ জীবনযাত্রার সাথে সাংঘর্ষিকতার কারণে তাদের প্রতি অনাসক্তি পকাশ করবে। ফলে তারা BNP এর দিকে ঝুঁকে পড়বে। ব্রিটিশবাসীরা মন্ত্রীপর্যায়ে যতবেশি হিজাব পরিহিতা আর দাড়িওয়ালা দেখতে পাবে, ততই তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে আর BNP ততবেশি সমর্থন পেতে থাকবে। কাজেই "সাদ্দামপ্রিয় কাউকে ভোটপ্রদানের মাধ্যমে BNP এর ক্ষমতায় আসা ঠেকিয়ে রাখা যাবে"- এরকম যুক্তি সম্পূর্ণ অসার ও অগ্রহণযোগ্য। এটা জনগণকে জুজুর ভয় দেখানোর জন্য সেক্যুলারদের মিথ্যাচারের আরেকটি দৃষ্টান্তমাত্র।

তৃতীয় দাবীঃ যেহেতু আমরা "তাদের ভূমি"তে বাস করছি, কাজেই তাদের সাথে নির্বাচনে অংশগ্রহণ আবশ্যক [বিশেষ করে পশ্চিমা/ইউরোপ দেশগুলোতে]

এটা হল সবচেয়ে বিভ্রান্তি ও মূর্খতাপূর্ণ যুক্তিগুলোর একটি, যা কিনা কতিপয় "আলিম"দ্বারা স্বীকৃত !! কেউ একজন কোন নির্দিষ্ট ভূমিতে বাস করছে বলেই কি তার চারপাশের লোকদের শরীয়াহ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারবে? এই বিভ্রান্তিকর যুক্তি অনুযায়ী তো তাহলে অঞ্চল বিশেষের মুসলিমরা সমকামী হতে পারে, মদপান করতে পারে, জুয়া খেলতে পারে, তাদের সন্তানদের বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড রাখার অনুমতি দিতে পারে !! কেননা চারপাশের লোকেরা তো এসব করেই থাকে !! আমি ঐসকল 'আলিম ও মুফতীর কাছে জানতে চাই, তারা যদি লূত (আ) এর যুগে থাকতেন, তাহলেও কী একই কথা বলতেন!!

কুফরি নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি মুসলিমদের আহবানের জবাব হওয়া উচিত সেইরূপ, যেমনটা কুরাইশ কাফিরদের দিতে রাসূল (সা) কে আল্লাহ্ আদেশ করেছিলেন। যখন কুরাইশরা মুহাম্মাদ (সা) কে তাদের সিস্টেমে যোগ দিতে আহ্বান করল, তিনি বললেনঃ

> বলুন, হে কাফিরকুল ! আমি উপাসনা করিনা, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যার উপাসনা আমি করি। এবং আমি উপাসক নই, যার উপাসনা তোমরা কর। এবং তোমরাও উপাসক নও

তাঁর, যার উপাসনা আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্য এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্য। [সূরা কাফিরূন]

চতুর্থ দাবীঃ যে সমাজে আমরা বাস করি, সেই সমাজকে কিছু দেওয়া প্রয়োজন

এ যুক্তিটি সম্প্রতি আবির্ভূত হয়েছে। তা হল এই যে, পাশ্চাত্যে যেসব মুসলিম বাস করে, সেখানে সুনাগরিক ভাবমূর্তি ধরে রাখতে সমাজকে কিছু দেওয়া তাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এমন যে, সেদেশের কুফর সরকার মুসলিমদের দয়াপরবশ হয়ে থাকার সুযোগ করে দিচ্ছে, কাজেই এমন উদারতার জন্য মুসলিম নাগরিকদের উচিত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। যদিও এটা আসলে প্রাচীন এশিয়ান অভিবাসীদের দাসসুলভ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের মুসলিমদের মধ্যেও এধরনের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এটা বলছি না যে একজন মুসলিমের জন্য তাঁর চারপাশের পরিবেশের প্রতি কোনরূপ অবদান রাখা হারাম। একজন মুসলিম সর্বপ্রথম তার চারপাশের মুসলিমদের সাহায্য করেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

“নিশ্চয়ই বিশ্বাসী মুসলিমেরা ভাইস্বরূপ” [সূরা আম্বিয়া-৯২]

আর মুসলিমদের মধ্যে যারা কাফিরদের সন্তুষ্ট করতে কাজ করে, তাদের জেনে রাখা দরকার যে তাদের এই কাজের কোন গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহর চোখে নেই। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এ কাজ তাদেরকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিতে পারে। যেমন পুলিশ বা আর্মিতে চাকরি নেওয়া, কিংবা সংসদ সদস্য হওয়া।

পঞ্চম দাবীঃ যেহেতু সংখ্যায় আমরা কোন পরিবর্তন ঘটানোর মত যথেষ্ট নই, সেহেতু আমাদের এখানকার প্রচলিত আইন- কানুনই মেনে চলতে হবে।

এ যুক্তিটি পরাজিত মানসিকতারই লক্ষণ, ইসলামে যার কোন ভিত্তি নেই। সর্বপ্রথম আমাদের মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত আইনগুলোর বেশিরভাগই কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মূল প্রশ্নটা হল কাফিরদের ভূমিতে তাদের কুফরি আইন মেনে চলা যাবে কিনা। আর আল্লাহ্ মুসলিমদের বিশেষভাবে আদেশ করেছেন যেন তারা কাফির- মুশরিকদের কথা মেনে না চলে। আল্লাহ্ বলেনঃ

“হে নবী ! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়”। [সূরা আহযাব- ১]

আর আমরা ইতোমধ্যে দেখিয়েছি আল্লাহ্‌র আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইনপ্রণেতার আইন কীভাবে একজন মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। আল্লাহ্‌ বলছেনঃ

"যদি তোমরা তাদের (মুশরিকদের) আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে"। [সূরা আন- আমঃ ১২১]

বর্তমান বাস্তবতার সাথে এ আয়াতকে মিলিয়ে দেখতে গেলে আমরা বলতে পারি ফ্রান্সের কথা, যেখানে স্কুল এবং পাবলিক প্লেসে হিজাব নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ যেসব নারী তাদের আইন মেনে নিয়ে হিজাব পরিত্যাগ করল, তারা কাফির আইন প্রণেতাদের আইনকে আল্লাহ্‌র আইনের উপর প্রাধান্য দিল। আর এভাবে তারা যেন কাফির- মুশরিকদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ব্যাপারটি কত ভয়ানক, ভাবা যায়!! তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্‌র বিধানকে মেনে চলা অথবা সেখান থেকে এমন কোথাও চলে যাওয়া যেখানে তারা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে অপেক্ষাকৃত কম বাধার সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্‌ এটাও বলে দিয়েছেন যে কেউ যদি কাফিরদের অনুসরণ করে আর তাদের মেনে চলে, তবে সেও কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে"। [সূরা আল- ইমরানঃ ১০০]

ষষ্ঠ দাবীঃ ইসলামে রাজনীতি নেই/রাজনীতির মধ্যে ধর্মকে টেনে আনা দূষণীয়।

এটা ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদারদের একটি অতি প্রচলিত বক্তব্য। এরা সবসময় দাবি করে থাকে, ধর্ম আর রাজনীতি দুটি পৃথক জিনিস এবং মসজিদের বাইরে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ইসলামের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। বৃটেনের 'মুসলিম পার্লামেন্ট', আরো নির্দিষ্টভাবে বললে তাদের পথভ্রষ্ট ধিকৃত নেতা গিয়াসউদ্দিন সিদ্দিক পর্যন্ত এমন বক্তব্য দিয়েছিল। এরা হল ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও নিজেদের 'মুসলিম' পরিচয় নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা লোক, যারা যুগের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে স্রষ্টাপ্রদত্ত বিধানকে নিজেদের পছন্দমত পরিবর্তন করে থাকে। এরা বলে থাকে, যারা শরীয়াহ মেনে চলতে চায় এবং বাস্তব জীবনে শরীয়াহকে বাস্তবায়ন করতে চায় তারা যেন মধ্যযুগের অন্ধকার সময়ে ফিরে যাওয়ার মত পশ্চাৎপদতার দিকে যেতে চাচ্ছে। এদের এসব বক্তব্য আর দৃষ্টিভঙ্গি তাদের ইসলামচ্যুত করে ফেলার জন্য যথেষ্ঠ, কেননা তারা কুরআন-সুন্নাহকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না, মেনে নিতে পারে না। এরা তো ঐসকল লোকেদের মত, যারা কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর বাকি অংশ ছুড়ে ফেলে দিতে চায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেনঃ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দূগর্তি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন"। [সূরা বাক্বারাঃ ৮৫]

এসব লোকেরা বোঝে না যে আল্লাহ্ কুরআন নাযিল করেছেন সমগ্র মানবজাতির জন্য, যাতে সারা বিশ্বের মানুষ তাঁর আইনের আশ্রয়ে একত্রিত হয়। তারা ইসলাম বিস্তারের জন্য কাজ করলে সেটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। আল্লাহ্ বলেনঃ

"অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মন্ডলের পালনকর্তা ও নভোমন্ডলের পালনকর্তা আল্লাহরই প্রশংসা"। [সূরা আল জাসিয়াঃ ৩৬]

আল্লাহ্ আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে তার সবকিছুর মালিক। সবকিছুর প্রভু। তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল তাঁকেই মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আইন মেনে চলা শিরকের নামান্তর। আর আল্লাহ্ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। আজ গোটা বিশ্ব কাফির আর মুরতাদ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, যারা কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত এবং এসবের অনুমোদনও দিয়ে থাকে। এরা সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রভু আল্লাহ্র আইনের চেয়ে নিজেদের বানানো আইনকে উত্তম বলে দাবি করে থাকে।

ভোট প্রদানের পক্ষে তাদের ইসলামিক যুক্তি অর্থ্যাৎ যে যুক্তিগুলো তারা ইসলামসম্মত বলে দাবি করে থাকে

আমরা এতক্ষণ কিছু যুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি, যা ইসলাম ও বাস্তবতা উভয় সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত কিছু 'মুসলিম' আলেমগণ দিয়ে থাকেন। ইসলামিক যুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনার পূর্বে এগুলো আলোচনার কারণ হল, স্কলাররা ভোটপ্রদানের পক্ষে যেসব ফাতওয়া দিয়েছেন তার অধিকাংশই ইসলামের দলিল- প্রমাণ বাদ দিয়ে উপরের যুক্তিগুলোর আলোকেই তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অজ্ঞ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে তাদের যুক্তির স্বপক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

যা হোক, আমরা এখন সংক্ষেপে তাদের ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিগুলো তুলে ধরতে যাচ্ছি। কুফর সিস্টেমে ভোটপ্রদান শরীয়াহ সম্মত কি না, এই আলোচনার মাধ্যমে সে ব্যাপারে আমরা সংশয় নিরসনের চেষ্টা করব।

প্রথম যুক্তিঃ "দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটি গ্রহণ করা"

এসকল আলিমরা তাদের দাবীর পেছনে যে প্রধান যুক্তিটি দাড় করায় তা হল, মুসলিমদের উপর কুফুরি (গণতন্ত্র) প্রয়োগ করতে গিয়ে দুই খারাপের মধ্যে তুলনামূলক কম খারাপ কাফিরকে ভোট দেয়া ইসলাম অনুমোদন করে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সমর্থকরা এই নীতিকে দুইভাবে ব্যবহার করে থাকেঃ ১) যে প্রার্থীর আদর্শ অপেক্ষাকৃত কম ইসলাম বিরোধী তাঁকে ভোট দেয়ার মানে হল কম খারাপের পক্ষ নেয়া; ২) অন্য দিকে কাউকে যদি ভোট দেয়া না হয় তাহলে বেশী খারাপ প্রার্থীটি নির্বাচিত হতে পারে এই আশংকায় কম খারাপকে ভোট দেয়া।

কিন্তু এই বিষয়ে সত্য এই যে, এই সকল তথাকথিত আলিমরা শরিয়াহ'র একটি বৈধ নীতি যা "দুটি খারাপের মধ্যে তুলনামূলক কম খারাপটি গ্রহণ করা" নামে পরিচিত, তার অপব্যবহার করে। মুবাহ'র (অনুমোদিত) বিষয়গুলোতে যেখানে বিকল্প আছে সেখানে কেউ নিজের জন্য তুলনামূলক কম ক্ষতিকর বিষয়টি বেছে নিলে আপত্তি নেই।

যেটা অনুমোদিতঃ জীবন মরণ প্রশ্নে যে কারো জন্য এমন কিছু খাওয়া বা পান করা অনুমোদিত যা সাধারণভাবে হারাম। যেমন- মৃত প্রাণীর মাংস, মদ ইত্যাদি।

অনুমতির সীমাঃ এই অবস্থায় একজন মুসলিম প্রয়োজনীয় সেই পরিমান মাংস খেতে পারবে যাতে সে আরোগ্য লাভ করতে পারে। তার ব্যাপারে কি বলা যেতে পারে যার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমানে খাদ্য থাকার পরেও সে আগ বাড়িয়ে মৃত প্রাণীর মাংস কিংবা শুকর ভোজন

উপভোগ করা শুরু করে দেয় এবং অন্যদেরও আমন্ত্রণ করে তার সাথে ভোজে শরিক হতে? সেক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে এটা বলা যাবে যে সে "দুই প্রকারের খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটি গ্রহণ করা" নীতির অপব্যবহার করছে এবং একারণে সে গুনাহ করছে।

উপরন্তু এই অনুমোদিত বিধানটিই নতুন এই বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করা যাক আর দেখা যাক এতে আদৌ উপকারী কিছু আছে কিনা -

নতুন ঘটনাঃ হয় ভোট নতুবা মৃত্যু? ভোট দেয়ার এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ক্ষেত্রে এই নীতিমালাটি প্রয়োগের আদৌ কোন উপমা কিংবা কিয়াসের অবকাশ নেই। প্রথমত, মরুভূমিতে অসহায় পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাণ হারানোর ভয়ে হারাম মাংস খাওয়া যাবে; এটা একটি জীবন-মরনের ইস্যু এবং কোন উপায়ও নেই। এখন, যদি আমরা ভোট না দেই তবে কে আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে? তো এখানে কোথায় দুটি মন্দ বিষয় রয়েছে যেখানে একজনকে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটি গ্রহণ করতে হচ্ছে? এখানে সুস্পষ্টভাবে দুটি পথ খোলা আছে একটি হল ভোট প্রদান করা যা কিনা হারাম, অন্যটি হল ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা যা হল ওয়াজিব।

ঈমানকে দূর্বল করে দেয়াঃ "তুলনামূলক কম খারাপ গ্রহণ" নীতির আলোকে যে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে মূলত তা ঐ কম মন্দটি বেছে নেয়ার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আসলে, যে সকল মুসলিমরা "তুলনামূলক কম খারাপ" বলে ১৯৯২ সালের যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ক্লিনটনকে, ১৯১৭ সালে টনি ব্লেয়ারকে এবং ২০০০ সালে বুশ জুনিয়রকে ভোট দিয়েছিল, তারা ক্ষমতায় গিয়ে এমনভাবে আচরণ করল যা এই সরলমনা মুসলিমরা কল্পনাও করে নি। অধিকন্তু ভুলভাবে "তুলনামূলক কম খারাপ গ্রহণ" নীতিমালার প্রয়োগের ফলে মানব জীবনে সকল সমস্যার সমাধানে ইসলামের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ব্যাপকতা রয়েছে সে ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ে।

মিথ্যার প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনাঃ যদিও গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস না রেখে মুসলিমরা প্রার্থীদের ভোট প্রদানের বিষয়টি ধারাবাহিক ভাবে চালিয়ে যায় তবে এভাবে যদি কুফরের সাথে সহাবস্থানে চলে আসে তবে একটা সময় পর মুসলিমরা ভাববে, আসলে মানুষের সকল সমস্যার সামাধান ইসলামে নেই। কারণ ক্রমাগত মিথ্যাকে আকড়ে থাকলে মানুষ এক সময় একে সত্য ভাবতে শুরু করে। এভাবে কুফরের সাথে ক্রমাগত সহাবস্থানের ফলে কিছু লোক এক সময় সম্পূর্ণ দ্বীনই ত্যাগ করে।

শয়তানী বিকল্পঃ যেসকল তথাকথিত মুসলিমরা যারা "তুলনামূলক কম খারাপ" নীতির গ্রহণ করে এই কুফরী নির্বাচনে ভোট প্রদান করে, তারা প্রায়শ "তুলনামূলক কম খারাপ" কে খারাপ হিসেবেই বিবেচনা করে না, বরং এটাকে তারা অনুমোদিত একটি বিকল্প হিসেবে গণ্য করে।

পশ্চিমা কুফরী সমাজে এই মানসিকতার ব্যপক চর্চার মাধ্যমে অনেক মুসলিম এতে বৈধতার গন্ধ খুঁজে পায়; সম্ভবত অনেক মুসলিম তো এই কাজকে প্রশংসনীয়ও মনে করে!

মন্দের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াঃ এই গ্রহণযোগ্যতার একটি নিদর্শন হল, এই ধরণের মন্দ কাজগুলো বিনা সংকোচে এবং স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করা হয়! যদি প্রতারণা কিংবা চুরির দায়ে কারো বিরদ্ধে কোন মামলা করা হয়, তবে তা জনসম্মুখে আনা হয়না! অধিকন্তু, এই কুফর রাজনৈতিক দলসমূহ কিংবা মসজিদ কমিটির তথাকথিত মুসলিমদের এসব মন্দ কাজগুলোকে নির্দ্বিধায় স্বাভাবিক জ্ঞান করে থাকে, এমনকি কেউ এই ভুল গুলোকে তুলে ধরলে আশ্চর্য হয়ে যায়! একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, আজকের "কম মন্দ" বিষয়গুলো কদিন আগে ছিল "বড় মন্দ" এবং এভাবে চলতে থাকলে একটা সময় আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের ইসলামী চেতনাবোধকেই হারিয়ে বসব! একজন ভয়ে কম্পিত হয়ে যায় যে আজকের কম খারাপ আগামীকাল কি হবে! ভবিষ্যতের সম্ভাব্য তুলনামূলক মন্দ বিষয়গুলো চিন্তা করতে গেলে আপনি শিহরিত হবেন!

ভোটের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগকে এভাবে দেখা যায়ঃ কোন এক ব্যক্তি একজন মুসলিম ভাইকে মদ খাওয়ার দাওয়াত দিল। সেখানে একটি মদে থাকবে ৫০% এলকোহল এবং অন্য একটি মদে ২৫% এলকোহল। সুতরাং সে দাওয়াত গ্রহণ করে ২৫% এলকোহলের মদটি পান করল।

মূলত, মুসলিম হিসেবে আমারা সত্যিই ভাগ্যবান যে আমাদের শরিয়াতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা এর রক্ষনাবেক্ষনের অঙ্গীকার করেছেন। তাই আমাদের অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা তালাশের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় যুক্তিঃ শরীয়াহ মতে ক্ষতি অবজ্ঞা করে সুবিধা গ্রহণ করা নীতির অনুসরণ

এই দুষ্ট প্রকৃতির আলেমগণ মুসলিমদের মাঝে এ ধরণের ফতোয়া দিয়ে বলে থাকে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার শরীয়াহ নাযিলের উদ্দেশ্য হল মানবজাতির উপকার সাধন। অতএব যে বিষয়গুলো উপকারী সেসব অনুমোদিত এবং যেসব বিষয় ক্ষতিকর তা হারাম। হকপন্থী উলামাগণও শরীয়াহ এর উদ্দেশ্য (মাকাসিদ) আলোচনায় ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দকে প্রতিরোধের কথা বলে থাকেন; কিন্তু তাঁরা কখনো বলেননি যে এই ভালো- মন্দ মানুষের ইচ্ছার অনুগামী হবে।

শ্বাশ্বত বিধানঃ ইসলাম মানুষের আবেগ এবং কামনা বাসনা কিংবা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়নি। বরং ইসলাম হল মানুষের ইচ্ছা- অনিচ্ছাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার আদেশ –নিষেধের নিকট সমর্পণ। আল্লাহ হলেন আন– নাফি (কল্যাণকর্তা) আদ- দার

(অকল্যাণকর্তা) এবং উভয়ই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা কুরআনে ঘোষনা করেছেন,

> তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [সূরা বাকারাহ ২: ২১৬]

হাদীস থেকে দলীল

এটা খুবই সুপরিচিত একটা হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

> আমি তোমাদেরকে যেসব বিষয় নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাক। আর যেসব বিষয়ে আদেশ করেছি, যথাসম্ভব তা পালন কর। [বুখারীঃ ৭২৮৮, মুসলিম: ১৩৩৭]

আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা- আকাঙ্খা অনুগত না হয়ে যায়। [আন নাওয়াবী চল্লিশ হাদিস]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

> যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় সংযুক্ত করবে যা তার অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে (অর্থাৎ তা গ্রহণযোগ্য হবে না)। [বুখারী: ২৬৯৭, মুসলিম: ১৭১৮]

মুসলিমের বর্ণনার ভাষা হলো এই যে,

> যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে যা আমাদের দ্বীনে নেই, তা গ্রহণযোগ্য হবে না (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে)। [আন নাওয়াবী চল্লিশ হাদিস]

কুরআনের দলীল

যারা আল্লাহ্‌র বিধানের উপর নিজেদের মতামত দেয় কিংবা বিচার ফয়সালা করে

> "আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল- খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে?" [সূরা জাসিয়া ৪৫: ২৩]

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন সেটা ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ইসলামে নেই,

> আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। [সূরা আহযাব ৩৩: ৩৬]

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কর্তৃক এই যুক্তি খন্ডন

এই ধরনের ভালোকে গ্রহণ এবং মন্দ বর্জনের খোঁড়া যুক্তি আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা নিজেই কুরআনে খন্ডন করেছেন,

> বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন- সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান- যাকে তোমরা পছন্দ কর- আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। [সূরা তাওবা ৯: ২৪]

উপরে বর্ণিত আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেসব বিষয়সমূহগুলো উল্লেখ করেছেন তা দৃশ্যতঃ সবই মানুষের জন্য উপকারী এবং কল্যাণকর – নিজেদের জীবন, সম্পদ, নিজের পরিবার ইত্যাদি। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেন, এসব বিষয়গুলো যদি আল্লাহ্, তাঁর নবী, এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ অপেক্ষা বেশী প্রিয় হয় তবে তোমাদের উচিত আল্লাহ্‌র শাস্তির জন্য অপেক্ষা করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা জিহাদের মতো অবশ্য- করণীয় আমল থেকে পালিয়ে থাকতে এই ধরণের দৃশ্যত উপকারী বিষয়গুলোর অজুহাত অনুমোদন করেন নি এবং আমাদের যথাসম্ভব এই দায়িত্বসমূহ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি হারাম কাজসমূহ থেকে আমাদের সম্পূর্ণ বিরত

থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে আমরা পার্থিব কিছু সুযোগ সুবিধার জন্য এই ধরণের নীতিমালা নিয়ে তর্ক করি??

যদি শরীয়াহর উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষের সীমিত জ্ঞান এবং অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হত, তবে কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদের জন কিছু নির্দিষ্ট বিষয় হারাম জানিয়ে দিয়ে বাকিগুলো হালাল করেছেন? যদি প্রত্যেক মুসলিম নিজ নিজ সুযোগ- সুবিধার জন্য নিজেদের উপলব্ধি থেকে কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল তা বিচার করে তাহলে শরীয়াহ নাযিল হল কেন??
উত্তর হল, এ ধরনের নীতিমালা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় এবং উপরন্তু যারা এই ধরণের নীতিমালায় আহবান করে তারা মূলত ইসলামী শরীয়াহ লঙ্ঘনের আহবান করছে এবং এটা মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার বিধানকে অমান্য করার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়।

তৃতীয় যুক্তিঃ আ'লিমদের বেশিরভাগ এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেন। তাঁদের এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে শুনি নি।

একথা সত্য যে, যারা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল এবং কুরআন- সুন্নাহর বিধান এবং দলিল- প্রমাণ সম্পর্কে অজ্ঞ তারা এ জাতীয় যুক্তি দ্বারা সহজেই পরাস্ত হয়ে থাকে। ইসলামের প্রকৃত বিধানের তোয়াক্কা না করে ভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের পক্ষে থাকা সংখ্যাধিক্যের দোহাই দিয়ে বলে- "আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সব মসজিদের ইমামেরাও আমাদের মতের পক্ষেই বলেছেন। অতএব ভোটপ্রদান অবশ্যই বৈধ।"

একজন সত্যিকারের মুসলিম কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের উপর নির্ভর করেন না। সত্যিকারের ঈমানদারেরা কুরআন- সুন্নাহর আলোকে কোনটা গ্রহণযোগ্য- সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তাঁরা পূর্ববর্তী হক্কানী আ'লিমদের ব্যাখ্যা ও মতামত গ্রহণ করে থাকেন। বস্তুত মহান আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের বহু জায়গায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি ঝুঁকে পড়ার মানসিকতাকে বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে।" [সূরা আন'আম- ১১৫]

"আপনি যতই চান না কেন, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়।" [সূরা ইউসূফ- ১০৩]

রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও সংখ্যাধিক্যের মতকে প্রাধান্য দেবার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, যদি যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ভ্রান্ত হয়ে থাকে (অর্থাৎ তাদের মতামত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হয়)।

ইমাম নববী (রহ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেনঃ

"সত্যের পথ অনুসরণ কর, যদি তা অল্প লোকেও করে থাকে, আর আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে মৃত্যবরণ করো না, যদি বেশিরভাগ লোকেও তা করে থাকে।"

রাসূল (সা) এটাও বলে গেছেন যে যারা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকবে, তারা সংখ্যায় সামান্যই হবে। তিনি বলেনঃ

“আমার উম্মাতের মধ্যে একটা ছোট অংশ থাকবে, যারা আল্লাহ্‌র হুকুমের প্রতি অবিচল হবে, তারা বিরোধীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হবে না, তারা সর্বদা আল্লাহ্‌র হুকুম বাস্তবায়নে অগ্রসর থাকবে। আর এই দলটিই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে।” [মুসলিম]

ইসলামিক পদ্ধতিঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুসলিমদের আদেশ করেছেন কেবল তাঁরই বিধান মেনে চলতে, কেবল তাঁরই আইন নিজেদের জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আল্লাহ্‌ বলেনঃ

“আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন- যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন।” [সূরা মায়িদাহ- ৪৯]

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" [সূরা আন নিসা- ৫৯]

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" [সূরা আহযাব- ৩৬]

বস্তুত যেসব লোক আল্লাহ্‌র বিধানের উপর কাফিরদের আইনকে প্রাধান্য দেয়, মনে মনে তারা একে ঘৃণা করুক বা না ই করুক, তারা কাফিরদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেনঃ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।" [সূরা নিসা ৪: ৬০]

কোন সামঞ্জস্যতা নেই: উল্লেখিত আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করছে যে ক্ষমতার মালিক, আইনের মালিক কেবল আল্লাহ্। আর তিনিই সার্বভৌমত্বের মালিক, একমাত্র বিধানদাতা। গণতন্ত্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যার আইন, প্রক্রিয়া সবই কুফর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ্যাৎ সেসব বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা আল্লাহ্‌র আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। তাহলে ইসলাম কীভাবে গণতন্ত্রকে মেনে নিতে পারে?

বাছাইয়ের সুযোগ নেইঃ একজন মুসলিম কীভাবে কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পদ্ধতিতে কাউকে নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে পারে? এই কুফরি গণতান্ত্রিক প্রথায় সরাসরি আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধিতা করা হয়। এই পদ্ধতি আল্লাহ্‌কে বিধানদাতা হিসেবে অস্বীকার করে, হারামকে হালাল বলে ঘোষণা করার অধিকার রাখে, আল্লাহ্‌র আইনকে নিজেদের পছন্দমত সংখ্যাধিক্যের মতামতের দোহাই দিয়ে পরিবর্তনের অধিকার রাখে। এটি যেন আসমান- জমিনের মালিক, সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্‌র চেয়ে নিজেদেরকে বেশি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ বলে ঘোষণা করা। নিজেদের বানানো আইনকে আল্লাহ্‌র বিধানের উপর প্রাধান্য দেওয়া আল্লাহ্‌র চেয়ে নিজেকে ক্ষমতাধর ও প্রাজ্ঞ বলে দাবী করারই নামান্তর।

আপোষহীনতাঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মাক্কী জীবনেও দ্বীনের সাথে, আক্বীদার সাথে আর আল্লাহ্‌র হুকুমের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র আপোষ করেন নি। আল্লাহ্ তাঁর নবী (স) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি মুশরিকদের সাথে আপোষহীন মানসিকতা বহাল রেখে প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে যান। একই সাথে তারা আল্লাহ্‌র সাথে যে শিরক করছিল তার বিরুদ্ধে বলতে, সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজের নিষেধ করতে, আর লোকেদের ইসলামের দাওয়াত দিতে নির্দেশ দেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হকপন্থী ওলামাগণের উদ্ধৃতি

শেইখ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসী

"আমরা যা বিশ্বাস করি ও দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করি তা হল- আইনসভা/সংসদে অংশগ্রহণ করা কুফর আর আল্লাহর প্রতি শিরক- হোক তা "ইসলামী" নামধারী কোনো মুরতাদ রাষ্ট্রে কিংবা কোনো প্রকৃত কুফফার রাষ্ট্রে। কেননা এই আইনসভাগুলো আইন তৈরির ব্যাপারে আল্লাহর বদলে মানুষকে একচ্ছত্র অধিকার দেয়। অথচ এটা শুধুমাত্র আল্লাহর অধিকার। এ ধরনের কার্যকলাপ যে সুস্পষ্টতই মুকাফ্ফিরাত (যেসব কাজের কারণে কুফরি হয়) এবং ঈমান বিনষ্টকারী তার অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে এবং আমার বই '*আদ- দিমুক্রাতিয়্যা দ্বীন*' (গণতন্ত্র-একটি দ্বীন) ও 'কাশফ আন-নিকাব' (নিকাব উন্মুক্তকরণ) ও আরও অন্যান্য বইয়ে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।"

শাইখ ডা. 'আবদুল কাদির বিন 'আবদুল আযিয

"যারা কিনা ভোটের মাধ্যমে আইনসভা/সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত করে তারাও একইভাবে কুফরী করছে, কেননা গণতন্ত্রের তত্ত্বমতে ভোটাররাই প্রতিনিধি হিসেবে সংসদ সদস্যদেরকে এই শিরকরূপ কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা প্রদান করে। সুতরাং ভোটাররাই সংসদ সদস্যদেরকে শিরক বাস্তবায়ন করার অধিকার দিচ্ছে। তারাই ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে আইনকর্তা প্রভু হিসেবে মর্যাদা দিচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

> "তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগনকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর কি তোমাদেরকে কুফরী করতে বলা হবে?" [সূরা আলে ইমরান ৩: ৮০]

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ফেরেশতা বা রাসূলগণকে রব হিসেবে গ্রহণ করলেই কাফির হয়ে যাবে, তাহলে সে যদি সংসদ সদস্যদের রব হিসেবে মর্যাদা দান করে তাহলে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়। আবার এই আয়াত হতেও আমরা অনুরূপ শিক্ষা পাইঃ

> "বলুনঃ হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।" [সূরা আলে ইমরান ৩: ৬৪]

শাইখ ডা. হামেদ আল-আলীঃ

"গণতন্ত্রের মূলনীতিই এরূপ যে গণতন্ত্রের দার্শনিক বা আদর্শিক ভিত্তিটাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী। গণতন্ত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শরীয়াহকে কোনো মূল্য দেয়া হয় না, বরং এই ব্যবস্থায় সকল ক্ষমতা মানুষের হাতে তুলে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দ্বীনের জন্য এই ব্যবস্থায় কোনো জায়গা নেই। এটা সুস্পষ্টই কুফর, গণতন্ত্রের ধারণা ও মূর্তিপূজার মধ্যে বস্তুত কোনো পার্থক্যই নেই। আইন প্রণয়নে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একচ্ছত্র অধিকারকে নিজেদের দখলে নেয়া এসব আইনপ্রবক্তাদের নির্বাচিত করা আর মূর্তিপূজা করা সমান।"

শেইখ মুহাম্মাদ নাসির উদ দীন আল-আলবানীঃ

"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

> আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই [সূরা ইউসুফ ১২: ৪০]

তিনি আরো বলেন,

> "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" [সূরা আল মায়িদা ৫: ৪৪]

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেছেন,

> "অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে"।[সূরা আন নিসা ৪:৬৫]

গণতন্ত্র এমন একটা ব্যবস্থা যা তাগুত (মিথ্যা রব)। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলমানদের আদেশ করেছেন তাগুতের প্রতি অবিশ্বাস ঘোষণা করতে, তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

> "এখন যারা গোমরাহকারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়।" [সূরা বাকারাহ ২: ২৫৬]

সুতরাং গণতন্ত্র আর ইসলাম হল দুটি সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ব্যাপার যাদেরকে কখনোই একীভূত করা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তি হয় আল্লাহ তা'আলার উপর এবং আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দ্বারা শাসনের উপর ঈমান আনে অথবা তাগুত ও তাদের আইন-কানুনের উপর ঈমান আনে। প্রতিটি কাজ ও বিষয় যা আল্লাহর শরীয়াহর বিপরীতে যায় তা তাগুত হিসেবে বিবেচিত হবে"

শেইখ মুহাম্মাদ আল-শিনকীতিঃ

"কিন্তু আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টার নির্দেশিত আইনের বিরুদ্ধে যায় এমন আইনী ব্যবস্থার শরণাপন্ন হওয়া এটাই বুঝায় যে এখানে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টার উপর কুফরী করা হচ্ছে। যেমনঃ এমন দাবী করা যে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে নারীদের বদলে পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া অন্যায্য, অথবা বহুবিবাহ একধরণের জুলুম করা অথবা তালাক নারীদের প্রতি অবিচার কিংবা পাথর মেরে বা হাত কেটে শাস্তি দেওয়া হল বর্বরোচিত কাজ যা কারও ওপর প্রয়োগ করা সমর্থনযোগ্য নয় ইত্যাদি। সুতরাং মানুষের জীবন, সম্পদ, সম্মান, বংশ, চিন্তাধারা ও দ্বীন চালনা করার জন্য এ ধরনের ব্যবস্থার (গণতন্ত্র) বাস্তবায়ন করা প্রকারান্তরে বিশ্বজগতের স্রষ্টার প্রতি কুফর বুঝায়। যিনি সকল মানুষের স্রষ্টা ও যিনি মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর তৈরী করে দেয়া জীবনব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটা হল বিদ্রোহস্বরূপ। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার কোনো শরীক ব্যাতিরেকেই সম্মানিত এবং প্রশংসিত।

শেইখ ওমর বাকরি মোহাম্মদঃ

"গণতন্ত্র ও যারা এতে অংশ নেয় তাদের ব্যাপারে ইসলামের রায় হল নিম্নরুপ:

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলাই একমাত্র ও অনন্য আইনপ্রণয়নকারী ও আদেশদাতা নন সে একজন কাফির।

যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর বিশ্বাস আনে কিন্তু এ ব্যাপারে [আইন প্রণয়ন] আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, যা আল্লাহর একমাত্র আইনপ্রণয়নকারী ও আদেশদাতা হওয়ার বিষয়টিকে লঙ্ঘন করে, সে একজন মুশরিক (যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে)।

সংসদ হল আইনপ্রণয়ণকারী সংস্থা- এটা জেনেশুনে যে মুসলিম কাউকে ভোট দেয় সে একজন মুরতাদে পরিণত হবে। সংসদ হল দেশের আইনসভা- এটা জানার পরও যে মুসলিম সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য নির্বাচনে অংশ নেয় সে একজন মুরতাদ।

যে ব্যক্তি সংসদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত না হয়ে ভোট দেয় সেও গুনাহগার কারণ সে গুনাহ করার আগে এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান কি তা জানতে চায়নি যেহেতু ইসলামী বিধি হল যে প্রত্যেকটি শারীরিক বা মৌখিক কাজের ভিত্তি হতে হবে কুর'আন ও সুন্নাহ হতে আগত ইসলামী নির্দেশনা। বিপথগামী কোনো যুক্তিবাদী বা ধর্মনিরপেক্ষ ইমামের 'মতের' উপর ভিত্তি করে যে মুসলিম অপর কোনো মুসলিম বা অমুসলিম প্রার্থীকে ভোট দেয় সে ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে এবং বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে তার কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের একমাত্র বিধানকর্তা- এটা বিশ্বাস করা দ্বীন ইসলামে আবশ্যিক করা হয়েছে, সুতরাং এই ব্যাপারে অজ্ঞতা কোনো অজুহাত নয় এবং তাই সেই ব্যক্তি এই কারণবশত গুনাহগার হবে।"

শেইখ মুস্তাফা আবু বাসীরঃ

"অতএব গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ায় ভোট দেওয়া হল হারাম এবং নিষিদ্ধ। এর কারণ হল মানুষের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আছে এমন কোনো গুণাবলী এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ব্যক্তির নেই।"

যারা আল্লাহ সুবহানহু ওয়াতা'আলার রোষ-ক্রোধ উপেক্ষা করে ভোটে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য স্মরণিকা:

আমরা তাই শেষ স্মরণিকা ও সতর্কবাণী রেখে যাচ্ছি সেইসব জাহেল কাফেরদের জন্য যারা বাইরে গিয়ে গণতন্ত্রের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করবে, আলোচনা করবে, সমর্থন করবে ও আসন্ন নির্বাচনগুলোতে বার বার ভোট দেবে।

নিস্ফল প্রচেষ্টাঃ আমরা যে সুস্পষ্ট প্রমাণগুলো উপস্থাপন করলাম তা ইনশা'আল্লাহ আখিরাতে আপনাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এখন আপনাদের এই প্রিয় নেতাদেরকে ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে আপনারা যে তুচ্ছ ও নগণ্য সুবিধা ভোগ করছেন তা আখিরাতে কোনো কাজেই দিবে না। তখন প্রত্যেকটি কাজের জন্য আপনাদের জবাবদিহি করতে হবে। যদি এইসব নেতারা কুফরের উপর মারা যায় তাহলে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং আপনারাও আপনাদের প্রিয় নেতাদের সাথে সেখানে যোগ দেবেন, কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দুনিয়াতে যারা আপনার প্রিয় মানুষ ছিল তাঁদের সাথেই উত্থিত করবেন। সে দিন 'আমরা তো শুধুমাত্র আমাদের নেতাদেরকেই অনুসরণ করেছি' অথবা 'আমাদের আলেমগণ আমাদের এটা করার অনুমতি দিয়েছিলেন'- এরকম কোনো অজুহাত গৃহীত হবে না কারণ আল্লাহ সুবহানহু ওয়া তা'আলা বলেছেনঃ

"অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক। এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না।" [সূরা বাকারাহ ২:১৬৬-১৬৭]

স্বাধীনতা ও উদারনীতি: মানবজাতিকে স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব থেকে বের করে এনে মানুষ ও নফসের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার দাসত্ব করানো- এই লক্ষ্যেই কুফফাররা সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা যা ঘৃণা করেন তারা ক্রমান্বয়ে সেগুলোই গ্রহণ করে নিচ্ছে, এমনকি তারা অবাধভাবে Respect Party'র মত দল গঠন করছে যা জর্জ গ্যালোওয়ে ও তার সমমনাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা গর্বের সাথে সমকামীতা, ব্যাভিচার, বহুগামীতা, গর্ভপাত, পর্ণোগ্রাফী, নগ্নতা, মদ, জুয়া, অবাধ মেলামেশা ইত্যাদির প্রতি নিজেদের সম্মান ঘোষণা করে।

অতি অল্প বয়স থেকেই তারা আমাদেরকে ডারউইনের তত্ত্ব ও বিবর্তনবাদ, বিগ ব্যাং থিওরী ইত্যাদিতে বিশ্বাসী করে তোলে। তাদের কাছে বাকস্বাধীনতা মানে হল এটা বলতে পারা যে- "ইসলাম অত্যাচারী' বা 'ইসলাম হল পশ্চাদপদ' । অথবা ইসলাম আসলে কেমন সেটা তাদের মনের মতো করে ব্যাখ্যা করার অধিকার। কিন্তু যখন সত্য প্রচার করার চেষ্টা করা হয় সেটাকে তারা চরমপন্থা বলে সরিয়ে দেবে এবং এই বাকস্বাধীনতাকে রহিত করবে।

বর্তমানে আমরা শাইখ ফয়সাল, আবু হামযা, আবু কাতাদাহসহ অনেক আলেম ও অনেক দাঈকে দেখতে পাই যারা নিজেদের বাকস্বাধীনতা চর্চা করার কারণে কারারুদ্ধ হয়েছেন। কারণ একজন মুসলিমের জন্য এ ধরনের "মূল্যবোধ" [যেমন- Respect Party- র মূল্যবোধ] এবং কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আমাদের কিছুতেই এসব অন্যায় কাজের দিকে ঝুঁকে পড়া চলবে না বরং আমাদের উপর ফরয হল সমাজের অন্যায়গুলোকে প্রকাশ করে দেওয়া ও তাদের নিষিদ্ধ করা এবং সমাজে অনুপস্থিত থাকা ভালো কাজগুলোর ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া। আমাদের আহবান কোনো ধর্মহীন কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের জন্য নয় কিংবা তাদের আদর্শকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য নয়। আমাদের আহবান শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে। তাতে মানুষ আমাদের উপর যতই যুলুম করুক না কেন, কোনো সমস্যা নেই, কারণ আল্লাহ তা'আলার পুরষ্কার এর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম।

নীচ ও ঘৃণ্য মূল্যবোধঃ ভোট দেওয়ার জন্য মুসলমানদের আহবান জানানোর উদ্দেশ্য মূলত মুসলমানদেরকে অধিকতর মানসিক পরাধীনতার দিকে নিয়ে যাওয়ারই আহবান। এটি আল্লাহর শত্রুদের পক্ষ থেকে একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা যাতে মুসলমানরা কুফর সমাজের সাথে সম্পূর্ণরূপে একীভূত হয়ে যায় এবং যাতে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার (যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মহীনতা) মূল্যবোধ প্রবেশ করে, যা রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতা বা ধর্মহীনতার পথে নিয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক মুসলিমই আজ এই অবাধ স্বাধীনতার কুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। নিজেদের চারপাশে থাকা এইসব জীবনাচরণ ও মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করার ভয়ানক প্রভাব মুসলমানদের জীবনে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। নতুন প্রজন্মের মুসলিমরা তাদের চারপাশে থাকা কুফরীর মধ্যে আকন্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

উন্মত্ত ব্যভিচার ও যৌনাচার এমনকি সমকামীতাও মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। প্রবীণ মুসলিমরা নিজেদেরকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত হিসেবে আবিষ্কার করছেন। অথচ আগে ভাবা হতো যে, 'বৃদ্ধাশ্রম' এর অস্তিত্ব শুধু কুফফারদের দেশেই থাকে। কিন্তু স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিপরীত চিত্র তুলে ধরছে। উম্মাহ হিসেবে কি আমরা এই পথের পথিক হতে চাই?

অনৈসলামিক মূল্যবোধঃ পশ্চিমে যেসব মূল্যবোধকে প্রবলভাবে গর্বের সাথে সমর্থন করা হয় সেইসব ঘৃণ্য ব্যাপারগুলোকে কখনো ইসলামে গ্রহণ করা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। এগুলো হল শয়তান ও তার অনুসারীদের মূল্যবোধ। কিছু দুনিয়াবী লাভের আশায় নিজের দ্বীন বিক্রি করে দিয়ে এসব কুফর আইনকে ভোট দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আগুনে পোড়া কি কোনো লাভজনক বিনিময়? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে এসব কুফফারদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। অথচ এদেরকেই আজকাল আমরা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছি। তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না -তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন।"[সূরা আলে ইমরান ৩: ১১৮-১১৯]

তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেনঃ

"আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।

যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচারী।"[সূরা মায়িদা ৫: ৮০-৮১]

সার- সংক্ষেপ

যদি আমরা সত্যিকার অর্থে ইসলামের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাবো, ভোট প্রদান করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ যার অর্থ আপনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থা রাখছেন কিংবা বিশ্বাস করছেন। অন্তত অনুমোদন করছেন। এমনকি কিছু দলের লোকেরা এই ধরনের ভয়ংকর কথাবার্তা বলে থাকেন যে, দুনিয়ার জীবনযাত্রার জন্য মানবরচিত আইন বেছে নেয়ার অনুমতি আছে! যতো যাই বলেন, কিন্তু শেষ বেলায় মানতেই হবে, এই গণতন্ত্র এমন একটি ব্যবস্থা যা শরীয়াহর স্থান দখল করে আছে। সমকামীতা, পর্নোগ্রাফী, মাদক, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি বিষয়গুলো এই গণতান্ত্রিক দলগুলো সামাজিক অধিকারের নামে বৈধতা প্রদান করে যা ইসলামে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষনা করা হয়েছে।

উপসংহার

- ভোট দেওয়া হারাম কারণ এর দ্বারা মানুষ কুফর, শিরক এবং রিদ্দাহ'র দিকে চালিত হয়। আল্লাহ- র বিধানের পরিবর্তে নির্বাচন তথা গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়া কুফর।

- গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর পথ না, এবং মুসলিম দেশগুলোতে এই পদ্ধতি চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

- গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। বুশ- ব্লেয়ার- ওবামা- মুশাররাফ ইত্যাদি নির্বাচিত- পুনঃনির্বাচিত নেতাদের দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

- ভোট দেওয়ার মাধ্যমে বর্ণবৈষম্য এবং অবিচার বন্ধ হয় না, প্রতিরোধও হয় না। ক্ষমতায় যে রঙেরই মানুষ থাকুক না কেন, অন্যায় অবিচার এখনো প্রবল রূপ ধারণ করে আছে।

- দারুল কুফরে বসবাস করছেন বলেই আপনার জন্য ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক – এরকম কোনো নিয়ম নেই। কেউ আপনার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে আপনাকে ভোট দিতে বাধ্য করবে না।

- আপনি যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন তার প্রতি আনুগত্য কিংবা কৃতজ্ঞতা স্বরূপও ভোট দেওয়া যাবে না।

- পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে প্রতিপক্ষের তুলনায় মুসলিমদের ক্ষমতা, শক্তি ও সমর্থন বেশি, তাও ভোটে অংশগ্রহণ করা যাবে না। ইসলামের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি আছে, এবং ভোট দেওয়া কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এর মধ্যে পড়ে না।

- যেহেতু ভোট দেওয়া- না দেওয়ার উপর আপনার জীবন- মরণ নির্ভর করছে না তাই 'দুটো খারাপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটিকে গ্রহণ" – এর নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না।

- ভোট দেওয়া আপনার কোনো উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ্ আযযা ওয়াজাল আপনার ক্ষতি চান। ভোট দেওয়া এমন একটি কাজ যা আল্লাহ্- র ক্রোধের উদ্রেক করে। সমাজের চাপে পড়ে, হাল ফ্যাশানের অনুকরণে কিংবা জনমতের কাছে মাথা নুইয়ে এগুলোর দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে, আমরা মুসলিমরা ভোট দিতে পারি না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা জনপ্রিয়তার মাপকাঠি দিয়ে আমরা মুসলিমরা কোনো কিছুরই বিচার করবো না।

- গণতন্ত্র এবং নির্বাচন আল্লাহ্ আযযা ওয়াজালের শারীয়াহ এবং তাঁর মনোনীত জীবনবিধানের অংশ না। এবং এই বিধানকে দমনমূলক মনে করার কিছু নেই। আল্লাহ্ আমাদের মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানবজাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহীর মাধ্যমে আমাদেরকে নির্ভুল সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। স্রষ্টা অবশ্যই সৃষ্টির চাইতে অধিক অবগত। আল্লাহ্- র নাযিলকৃত আইনের মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালনা করা এবং বিচার করা ইবাদাত। অন্যদিকে আল্লাহ- র মনোনীত জীবনবিধান ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থার অধীনে থাকা ও একে মেনে নেওয়ার অর্থ আল্লাহ্- র অবাধ্যতা করা। একজন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁর শারীয়াহকে নিয়ে গর্বিত না হওয়া অযৌক্তিক এবং অর্থহীন। ওরিয়েন্টালিস্টদের চোখ দিয়ে ইসলামকে দেখা মুসলিমদের পরিচয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের উচিত ইতিহাস থেকে শেখা কিভাবে ইসলাম মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছে। আজকের পৃথিবীতেও, যদি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা হয়, তাহলে আইন, সামাজিক বিধান এবং ব্যবস্থাগত উৎকর্ষতার দিক দিয়ে আর কোনো শাসনব্যবস্থা কিংবা আদর্শই ইসলামের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

বাস্তব পদক্ষেপসমূহ

মুসলিম হিসেবে আমাদের উচিত কুফরের এই প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবেলায় আমাদের নিজেদের প্রতিরোধকে জোরদার করা। এই লক্ষ্যে ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের সাগরতুল্য ভান্ডারে ডুব দিতে হবে। প্রকৃত সত্য – হকের অন্বেষণ করে তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের তথাকথিত সামাজিক নেতৃবৃন্দ – যারা প্রয়োজনের খাতিরে যখনতখন ইসলামের বিপরীতে যেতে দ্বিধা বোধ করেন না – তাঁদের অনুকরণের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি খোঁজা আমাদের জন্য উচিত না।

পাশাপাশি আমাদের উচিত আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আ- র অনুসারীদের পাশে একতাবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো – তাঁরা যেখানেই থাকুন না কেন। যাতে করে খিলাফাহর অনুপস্থিতিতে আমরা একটি সচেতন জামাহ(pressure group) – এর ভূমিকা পালন করতে পারি।

সমাজের মধ্যে ভালো কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা দেওয়া মুসলিম হিসাবে আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাই আমাদের উচিত নির্বাচনকে বয়কট করা এবং অন্যান্য সকল মুসলিমকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের শিক্ষা দেওয়া এবং এজন্য অনুপ্রাণিত করা। এবং "এক উম্মাহ"- র আদর্শকে বলীয়ান করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ভূখণ্ডে অবস্থিত আমাদের মুসলিম ভাইদের সাথে সম্পর্ক জোরদার করা। এবং সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর মানহাজ অনুযায়ী খিলাফাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা।

আল্লাহ্ যেন আমাদের জন্য এ কাজ সহজ করে দেন।

আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। [সূরা নিসা ৪: ৬০]

ইসলামী শাসন

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে শিক্ষা মানবজাতির কাছে নিয়ে এসেছিলেন বর্তমান পৃথিবী তা থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। শাসনকাজ এবং বিচার আল্লাহ- র আইনের বদলে মানব রচিত আইনের মাধ্যমে করার কারণে দুঃখজনকভাবে মুসলিম উম্মাহও সামগ্রিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শিক্ষা ভুলে ইয়াহুদী- খ্রিস্টানদের অনুকরণে শারীয়াহকে ছেড়ে গণতন্ত্রের হারামে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু এসবের অর্থ এই না যে মুসলিমদের মাঝ থেকে ইসলাম হারিয়ে গেছে। বরং একদিকে আমরা যেমন দেখছি মুসলিম নামধারীরা প্রগতি এবং মুক্তচিন্তার নামে কুফর এবং শিরকে লিপ্ত হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য এক দল মুসলিম শক্ত হাতে ইসলামকে ধরে রেখেছে এবং ইসলামী শারীয়াহকে ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে। বিশেষ করে বিশ্বজুড়ে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ মুসলিমরা তাঁদের পিতামাতাদের প্রজন্মের তুলনায় অধিক হারে সঠিকভাবে ইসলাম পালন ও প্রতিষ্ঠার প্রতি আত্মনিয়োগ করছে। বর্তমানে শারীয়াহ- র দাবী মুসলিম বিশ্বে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল অভাবনীয়। মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে মুসলিমরা সক্রিয়ভাবে শারীয়াহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন। তাঁরা উম্মাহর সম্মান পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান দুনিয়ার সমস্যাগুলোর সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করছেন।

আমরা গণতন্ত্রের স্বরূপ এবং ভোট দেওয়ার প্রকৃত অর্থ উদঘাটনের লক্ষ্যে আপনাদের কাছে এই ছোট নিবন্ধটি উপস্থাপন করেছি। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে একমাত্র তাঁর; সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা একটি ভালো আমল হিসেবে কবুল করে নেন। আমারা আশা করি যারা কুফর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় তাদের বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিনে আমাদের এই প্রচেষ্টা সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এমন কোনো শার'ঈ বিধান নেই যা আমাদেরকে মানব রচিত আইনের জন্য ভোট দেওয়ার অনুমতি দেয়। এটি ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ঠিক যেভাবে মদ- জুয়া- যিনা এবং অন্যান্য হারাম কাজগুলো নিষিদ্ধ।

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমাদের তাই উচিত কঠোরভাবে এই হারাম কাজগুলোকে এড়িয়ে চলা। আমরা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে দু'আ করি, তিনি যেন আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাতে আত তাইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত করেন। আমীন।

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ- র জন্য, যিনি সকল জগতসমুহের প্রতিপালক।